সিরাতু আসমা'ইন নবী (সঃ)

(দারস-৮)

বিশ্বজগতের জন্য রহমত

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্ব জগতের জন্য রহমত ছিলেন। আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা সূরা আম্বিয়ার ১০৭ নং আয়াতে বলেছেন:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ

"আমিতো তোমাকে বিশ্ব জগতের প্রতি শুধু রাহমাত রূপেই প্রেরণ করেছি।"

এছাড়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে উল্লেখ করেছেন, তিনি হচ্ছেন "নবীউর রহমাহ" তথা রহমতের নবী।

প্রত্যেক নবী এবং রাসূল ছিলেন পৃথিবীর জন্য রহমত। তারা তাদের নিজস্ব উম্মতের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। কেননা, যদি নবী-রাসূলগণ রিসালাত, নবুওয়াত নিয়ে না আসতেন, তাহলে সকল মানুষই অন্ধকার, কুসংস্কারাচ্ছন্ন অবস্থায় জীবনযাপন করে, সে অবস্থায়ই দুনিয়া ছেড়ে যেতেন। এর প্রমাণ হচ্ছে সেই জাহেলী যুগ এবং বর্তমান সময়ের পৌত্তলিক সমাজগুলো। অন্যান্য নবীগণ পৃথিবীর জন্য উপহার হয়ে তাদের নিজ নিজ উম্মতের জন্য রহমত হিসেবে এসেছেন। যেমন কুরআনে এসেছে, নূহ আলাইহিস সালাম বলেছেন:

وَءَاتَىٰنِى رَحۡمَةٗ مِّنۡ عِندِهِۦ فَعُمِّيَتۡ عَلَيۡكُمۡ أَنُلۡزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمۡ لَهَا كَٰرِهُونَ قَالَ يَٰقَوۡمِ أَرَءَيۡتُمۡ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٖ مِّن رَّبِّى

"সে বললঃ হে আমার কাওম! আচ্ছা বলত, আমি যদি স্বীয় রবের পক্ষ হতে প্রমাণের উপর (প্রতিষ্ঠিত হয়ে) থাকি এবং **তিনি আমাকে নিজ সন্নিধান হতে রাহমাত (নবুওয়াত) দান করেন**, অতঃপর ওটা তোমাদের বোধগম্য না হয়, তাহলে কি ঐ বিষয়ে তোমাদের বাধ্য করতে পারি যখন তোমরা ওটা অবজ্ঞা করতে থাক?"

কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ

"আমিতো তোমাকে বিশ্ব জগতের প্রতি শুধু রাহমাত রূপেই প্রেরণ করেছি।"

এই عَٰلَمِينَ শব্দটি বহুবচন। এর অর্থ হচ্ছে, "সমস্ত জগৎসমূহ"। عَٰلَمِينَ অর্থ শুধু "বিশ্বজগৎ" নয়, বরং "বিশ্বজগৎ সমূহ"। শুধু আলাম অর্থ হচ্ছে জগত। এই সৌরজগত হতে শুরু করে মানুষের

জ্ঞানের সীমা যতদূর পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং এখনো পৌঁছাতে বাকি, এসবকিছুকে বলা হয় জগত তথা আলাম। এর বহুবচন হচ্ছে عٰلَمِينَ ।

মুফাসসিরগণ "জগৎসমূহ" এর অর্থ করতে গিয়ে বলেছেন, প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে আল্লাহ সুবাহানাহু তায়ালা জগত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। পাখিদের, পোকামাকড়ের, জিনদের, উদ্ভিদের, পানির, মাটির, মেঘমালার, গ্রহদের, নক্ষত্রদের, গ্রহাণুপুঞ্জের, নীহারিকাদের সহ জানা অজানা সকল কিছুর আলাদা আলাদা জগত আছে।
প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা একটি জগত হিসেবে বা উম্মত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।
তাহলে সমস্ত জগৎসমূহের অর্থ হচ্ছে, তামাম সৃষ্টি জগতের সকল/প্রত্যেকটি বিষয়ে সেখানে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুধুমাত্র এই পৃথিবী নয় বরং সকল জগৎসমূহের জন্যে রহমত হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পুরো বিশ্বজগত সমূহের জন্য রহমত, সেখানে জিন-মানুষ সহ সকল সৃষ্টি অন্তর্ভুক্ত। উদ্ভিদ, শুয়োর, বানর, জিন, পাহাড়, পর্বতসহ সমস্ত সৃষ্টিকূল সম্পর্কিত বিধান বিধান রয়েছে শরীয়তে মুহাম্মদীর মধ্যে।

- ব্যাঙ, সাপ, টিকটিকি, গুইসাপ মারা যাবে কিনা?
- আগুনে পুড়িয়ে কোন প্রাণী মারা যাবে কিনা?
- মেঘ যদি কালো হয় সেটার অর্থ কি?
- মেঘ যদি সাদা হয় সেটার অর্থ কি?
- কালো মেঘে ঢেকে গেলে সালাতের কি হুকুম হবে?
- সূর্যগ্রহণ হলে কি ধরনের হুকুম?
- বৃষ্টি না হলে কি হুকুম?
- বৃষ্টি মুষলধারে হলে কি করতে হবে?
- চন্দ্রগ্রহণ হলে কি অবস্থা হবে?
- ভূমিকম্প হলে কি করতে হবে?
- কেউ যদি কোন অদ্ভুত প্রাণী দেখে, যা ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। তাহলে সেই প্রাণীর সাথে কি রকম আচরণ করবে?

এভাবে প্রত্যেকটি সৃষ্টিকুলের প্রত্যেকটি বিষয় নিয়ে এই শরীয়তে মুহাম্মদীর মধ্যে বিধি বিধান বর্ণিত হয়েছে। একারণে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেন এই সমস্ত বিশ্ব জগতের জন্য রহমত, তার কিছুটা আচ করা যায়। তার আনিত এই শরীয়ত পুরো বিশ্ব জগতের প্রত্যেকটি সৃষ্টির অধিকারকে সমুন্নত করেছে। যদি আমাদের কাছে এই শরীয়তে এটা না আসতো যে, কোন প্রাণীকে অহেতুক হত্যা করা অথবা পুড়িয়ে মারা একটি পাপ বা গুনাহ, তাহলে আমরা তা কখনোই জানতে পারতাম না। সুতরাং এই শরীয়তের মাধ্যমে প্রত্যেকটি প্রাণিজগতের অধিকার রক্ষিত হয়েছে।
এভাবেই, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে সমগ্র বিশ্ব জগতের জন্য রহমত ও উপহার হিসেবে এসেছেন।

একটি হাদিসে আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ
’আবদুল্লাহ ইবনু ’আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহ ও অনুকম্পা প্রদর্শনকারীদের প্রতি আল্লাহ রহমানুর রহীম অনুগ্রহ ও দয়া বর্ষণ করেন। সুতরাং তোমরা জমিনের অধিবাসীদের প্রতি দয়া করো, তাহলে আকাশের মালিক তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করবেন।
মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত) পর্ব-২৫: শিষ্টাচার (كِتَاب الْآدَاب) - ৪৯৬৯-[২৩], সহীহ : আবী দাঊদ ৪৯৪১, তিরমিযী ২০০৬, সহীহুল জামি’ ৩৫২২, সহীহ আত্ তারগীব ২২৫৬, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৯২৫, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫৩৫৫, আহমাদ ৬৪৯৪, শু’আবুল ঈমান ১১০৪৮, আল মু’জামুল কাবীর লিত্ব ত্বারানী ১৪৬০, আল মু’জামুল আওসাত্ব ৯০১৩, আল মুসতাদরাক ৭২৭৪, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৮৩৬২।

“দয়া করা” আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ একটি রহমত। যা রাসুলুল্লাহ সাঃ এর হাদিসের মাধ্যমে এ বিষয়টা পুরো উম্মতের মধ্যে একটি কনসেপ্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এক সাহাবী একদা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছেন, “আপনি তো এত ছোট ছোট বাচ্চাকে এত দয়া-মায়া, আদর করেন, আমি তো আমার এতগুলো বাচ্চা থাকা সত্ত্বেও কাউকে তেমন আদর করি না।” তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা যদি তোমার অন্তর থেকে দয়ামায়াকে তুলে নেন, এতে আমার কি করার আছে?“

ছোট বড় নির্বিশেষে গরীব দুঃখী শত্রু বন্ধু সকলের প্রতি দয়া করা উম্মতে মুহাম্মদীর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য সমূহের একটি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরও খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য।

হাদিসে বর্ণিত নবীজির ﷺ বৈশিষ্ট্য

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত:

সদা জাগ্রত অন্তর

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চোখ ঘুমের সময় বন্ধ থাকলেও তার অন্তর সদাজাগ্রত থাকতো।
হাদীসে এসেছে,
আব্দুল্লাহ ইবনে মাসলামা (রাহঃ) ... আবু সালামা ইবনে আবদুর রাহমান (রাহঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আয়েশা (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, রমযান মাসে (রাতে) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নামায কিভাবে ছিল? আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, নবী (ﷺ) রমযান মাসে ও অন্যান্য সব মাসের রাতে এগারো রাকা'তের বেশী নামায আদায় করতেন না। প্রথমে চার রাকা'আত নামায আদায় করতেন। এ চার রাকা'আত আদায়ের সৌন্দর্য ও দৈঘ্যের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো না (ইহা বর্ণনাতীত)। তারপর আরো চার রাকা'আত নামায আদায় করতেন। তারপর তিন রাকা'আত (বিতর) আদায় করতেন। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি বিতর নামায আদায়ের পূর্বে ঘুমিয়ে পড়েন? নবী (ﷺ) বললেন, আমার চক্ষু ঘুমায় তবে আমার অন্তর ঘুমায় না।
সহীহ বুখারী হাদিস নং- ৩৫৬৯

মদিনায় দূরে কোথাও কোনো শোরগোল অথবা কোন ঘটনা দুর্ঘটনার দরুন, সামান্য কোন আওয়াজ হলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা বুঝে ফেলে সেদিক চলে যেতেন। এটি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি একটি মুজিজা ছিল। কেননা নবীদের অন্তর ঘুমানো সম্ভব না। যেহেতু তারা মানুষ এবং তাদের বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল, সেজন্য শুধু তাদের চোখগুলো ঘুমোতে। সাধারণ মানুষ ঘুমালে বিভিন্ন স্বপ্ন আসে

শয়তান কিংবা অন্যান্য কিছুর পক্ষ থেকে, কিন্তু রসূলদের স্বপ্নগুলো ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী। তাদের অন্তর সবসময় আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পৃক্ত থাকতো এবং আল্লাহ তা'আলা ঐ অবস্থাতেই সেখানে ওহি নাজিল করতেন। তাই, তাদের অন্তর ঘুমানো সম্ভব ছিল না।

জীবজন্তুর পরিচিত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জীবজন্তুরা চিনতে পারতো; তিনি আল্লাহর আখেরী নবী ও রসূল জেনে। হাদীসে এসেছে,

আব্দুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, আমরা একটি সফরে ছিলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য একটু দূরে গেলেন। আমরা তখন দুটি কবুতরের বাচ্চা দেখলাম। দুটি কবুতরের বাচ্চা, তার সাথে তাদের মা রয়েছে। আমরা তখন সেগুলোকে পাকড়াও করলাম। ধরে সেগুলো করে রেখে দিলাম। তখন এই বাচ্চা দুটোকে ধরার কারণে ওই কবুতরটি চারপাশে উড়তে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম তাঁর হাজত পূরণ করার পর আমাদের কাছে ফিরে আসলেন। তারপর তিনি বললেন, “দুটো ছানা পাকড়াও করার মাধ্যমে এই কবুতরটিকে কে ভীত-সন্ত্রস্ত্র করল? এই কবুতরের বাচ্চা গুলোকে তোমরা ছেড়ে দাও।”

এখন থেকে বোঝা যায়, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখার পর মা কবুতরটি ডানা ঝাপটানো শুরু করেছিল। এভাবে কবুতরটি যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিনতে পেরেছিল, এই বিষয়টি প্রমাণিত হয়।

হাদীসটি আবু দাউদ, মুস্তাদরাক হাকেম ও রিয়াদুস সলিহীন-এ এসেছে।

আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমাকে তার বাহন, উটের পেছনে নিয়ে চলতে লাগলেন। তখন আমাকে এমন কিছু কথা বললেন, যেগুলো আমি যেন আর কাউকে আর না বলি। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন হাজতে যেতেন তখন তিনি পর্দা গ্রহণ করতে পছন্দ করতেন অর্থাৎ কোন কিছুর আড়ালে গিয়ে তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজনগুলো মেটাতেন।) তখন তিনি একদিন এক আনসারী ভাইয়ের বাগানের দেয়ালের পিছনে গিয়ে তিনি একদিন এভাবে হাজত পূরণ করছিলেন। তখন হঠাৎ করে একটি উট আসলো। সেই উটটি তার পা ছুড়ছিল এবং তার

চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছিল। তখন তিনি বললেন যে, আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এই উটটিকে দেখতে পেল, তখনই সেই উটটি কান্না জুড়ে দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব খেয়াল করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটটির কাধে এবং মাথায় হাত বুলিয়ে দিল, তারপর উটটি শান্ত হয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডাক দিয়ে বললেন যে, "এই উটটির মালিক কে? তখন এক আনসারী যুবক উপস্থিত হলো এবং বলল, ইয়া রাসুলুল্লাহ উটটিতো আমার। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তুমি কি আল্লাহকে ভয় করো না? এই পশু প্রাণী গুলো, যার মালিক আল্লাহ তোমাকে বানিয়েছেন, সেই প্রাণী আমার কাছে অভিযোগ করেছে, তুমি তাকে ক্ষুদার্থ রাখ এবং তাকে ডবল কাজ করাও"
হাদীসটি ইমাম আহমাদ, ইমাম আবু দাউদ তাদের কিতাবে এনেছেন এবং হাদীসটি সহিহ।

ইবরাহীম ইবন মূসা (রহঃ) ..... আবদুল্লাহ্ ইবন কুর্ত (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দিনগুলোর মধ্যে আল্লাহর নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ দিন হল, নাহরের (কুরবানীর) দিন। এরপর এর পরবর্তী দিন (কুরবানীর দ্বিতীয় দিন)। রাবী বলেন, ঐ দিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট পাঁচটি বা ছয়টি (রাবীর সন্দেহ) কুরবানীর উট পেশ করা হয়। প্রতিটি উট তাঁর সামনে আসতে থাকে যে, তিনি কোনটি আগে কুরবানী করবেন (এটা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি মু'জিযা যে, পশুরাও তাঁর অনুগত হয়ে তাঁর কাছে আত্মসমর্পন করে।) এরপর এগুলো যখন পার্শ্বের উপর (নাহরের পর) পড়ে যায় তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অস্পষ্ট স্বরে এমন কিছু বলেন যা আমি বুঝতে পারিনি। জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারি যে, তিনি বলেছেন, কেউ (খাওয়ার জন্য) চাইলে এর গোশত কেটে নিতে পারে।
সুনান আবূ দাউদ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) - ১৭৬৫
এ থেকে বোঝা যায়, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, পশু পাখিদের কাছেও খুবই পরিচিত ছিল।

পশ্চাত দৃষ্টি
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেছনের দিকে দেখতে পেতেন। সাধারণত পেছনের দিকে দেখতে হলে আমাদেরকে ঘুরে দেখতে হয়, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

স্বাভাবিকভাবেই পেছনের দিকে দেখতে পেতেন। এটি সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মু'জিযার অন্তর্ভুক্ত।

আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ (রাহঃ) ..... আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমরা কি মনে কর যে, আমার দৃষ্টি (কেবল) কিবলার দিকে? আল্লাহর কসম! আমার কাছে তোমাদের খুশূ (বিনয়) ও রুকু কিছুই গোপন থাকে না। অবশ্যই আমি আমার পেছন থেকেও তোমাদের দেখি।
সহীহ বুখারী- ইসলামিক ফাউন্ডেশন নাম্বারঃ ৪০৭, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ৪১৮

আমর ইবনু খালিদ (রহঃ) ... আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমরা তোমাদের কাতার সোজা করে নাও। কেননা, আমি আমার পেছনের দিক থেকেও তোমাদের দেখতে পাই। [আনাস (রাঃ) বলেন] আমাদের প্রত্যেকেই তার পাশ্ববর্তী ব্যাক্তির কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলাতাম।
সহীহ বুখারী- ইসলামিক ফাউন্ডেশন নাম্বারঃ ৬৮৯, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ৭২৫

এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেছন দিকে দেখতে পেতেন।

ইবনে হাজার আসকালানী রহিমাহুল্লাহ তিনি বলেছেন, "তবে এ ক্ষেত্রে এই কথাটি যথাযথ সঠিক যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেছনদিকে দেখতে পেতেন। এই বিষয়টি তিনি দিব্য চোখে দেখতে পেতেন নাকি তার পিছনের দৃশ্য তার চোখের সামনে এনে দেখানো হতো, এই ব্যাপারে আমরা স্পষ্ট বলতে পারি না। যেকোনো একটি হতে পারে। তবে সবচেয়ে বেশি যেটি মনে হয় তা হল, তার পিছনের দৃশ্য টা সামনে এনে দেখানো হতো।"
এটি তিনি তার বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল বারী, প্রথম খন্ডের ৫১৪ নং পৃষ্ঠায় বলেছেন।

এই দেখাটা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা দেখতে পেতেন নাকি শুধুমাত্র নামাজের মধ্যেই পেছনদিকে দেখতে পেতেন? কিছু ওলামাগণ বলেছেন যে, শুধুমাত্র নামাজের মধ্যে তিনি দেখতে পেতেন, যেহেতু নামাজের মধ্যে পেছন দিকে কাতার সোজা করার বিষয়টি রয়েছে এবং সাহাবীগণ ঠিকমত নামাজ তাকে অনুসরণ করছে কিনা, জানার প্রয়োজন রয়েছে, তাই তিনি কেবল নামাজের মধ্যে পেছনে দেখতে পেতেন।

এবং তারা প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার যুদ্ধের সময় বিশ্রাম করছিলেন, তখন তার পিছন দিক থেকে একজন কাফের এসে তাকে আঘাত করতে চেয়েছিল। এটা একটা কারণ।
আরেকটি কারণ হচ্ছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় থাকাকালীন কুরাইশরা নামাজরত অবস্থায় তার পিছন দিক থেকে এসে উটের নাড়িভুড়ি তারপর চাপিয়ে দিয়েছিল।
এই বিষয়গুলো উল্লেখ করে তারা বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় যখন জামাতবদ্ধ হয়ে নামাজ আদায় শুরু করলেন, তখনই এটি হত।

তবে কথাটি যথাযথ শক্তিশালী নয়। এর কারণ হচ্ছে, এখানে এমন কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়, যেগুলো প্রমাণ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত এবং সালাতের বাহিরেও পেছনদিকে দেখতে পেতেন। যেমন, যুদ্ধের ময়দানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেছনদিকে দেখতে পেতেন। এবং অন্যান্য সময়ও পিছন দিকে দেখতে পেতেন এমন বর্ণনা রয়েছে।
অনেক সময় সাহাবীরা পিছন দিক দিয়ে আসছেন, তা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগেই টের পেয়ে যেতেন, কে আসছেন। তখন তিনি সেই মানুষটির নাম ধরে ডাক দিয়ে দিতেন। এভাবে প্রমানিত হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বাভাবিক সময়েও পেছনদিকে দেখতে পেতেন।
যেহেতু এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুজিযা ছিল, তাই মুজিযা সবসময় বিদ্যমান থাকাটাই অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

(নিম্নোক্ত বিষয়গুলো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যাপারে সহিহ হাদিসে সরাসরি আসেনি বরং ইঙ্গিত পাওয়া যায়।)

হাই তুলতেন না

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাই তুলতেন না। এই বিষয়টি কিছু ওলামাগণ প্রমানসহ বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়ে তারা বলেছেন যে, “আমরা যেই হাই তুলি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই হাই তুলতেন না। বলা হয়ে থাকে, এই হাই শয়তানের পক্ষ থেকে আসে।”
একথাটি ইমাম বুখারী তার তারিখুল কাবির এবং কিতাবুল আদাব এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

মাসলামা ইবনে আব্দুল মালিক বলেছেন, “রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো হাই তুলেন নি এবং এটি হচ্ছে তার নবুয়াতের একটি প্রমাণ।”
কিতাব غاية السول في خصائص الرسول ﷺ

এছাড়া, ইমাম মাকরিজি রহিমাহুল্লাহ, ইমাম বুখারীর কিতাব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এ কথাটি উল্লেখ করেছেন।

এছাড়া, মার্সার ইবনে ইয়াজিদ ইবনিল আসাম বলেছেন, “রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের মধ্যে কখনো হাই তুলেন নি।”

এছাড়া ইবনে সাঈদ থেকেও একই রকম হাদিস বর্ণনা হয়েছে। তিনিও বলেছেন, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের মধ্যে কখনো হাই তুলেছেন এমনটা দেখা যায় না।” *এটা “ইমতাউল আসমা” কিতাবের ১০ নং খন্ডের ৩২০ নং পৃষ্ঠায় এসেছে।*

এথেকে বিষয়টি বোঝা যাচ্ছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের মধ্যে কখনো হাই তুলতে না, এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত। নামাজের বাহিরে হাই তুলতেন কিনা, এ ব্যাপারে বিভিন্নজন বলেছেন, “তুলতেন না এবং এটি নবুওয়াতের আলামতগুলোর একটি।”

ইবনে আবী শাইবা এবং ইমাম বুখারী উল্লেখ করেছেন, “রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনোই হাই তুলেন নি।”

একইভাবে, ইমাম খাত্তাবি বলেছেন, “রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো হাই তুলেন নি। এবং এই বিষয়টি প্রমাণিত হয় যে, যেহেতু হাই তোলার ব্যাপারটা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখা হয়েছে। এই কারণে তিনি হাই তুলতেন না।”

ইবনে সিনা শিফা নামক যে গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, “রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো হাই তুলতেন না।”

ইমাম সুয়ূতীও বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন তার “খসায়েসুল কুবরা” গ্রন্থে।
এছাড়া “ফাতহুল বারী” কিতাবে ইবনে হাজার আসকালানী একথা গুলো উল্লেখ করেছেন।

এ থেকে বোঝা যায়, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনোই হাই তুলতেন না" এটাই যথাযথ বক্তব্য হতে পারে। কারণ হাদিসে স্পষ্ট রয়েছে,

"আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ হাঁচি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আর হাই তোলা শাইতানের পক্ষ থেকে। সুতরাং তোমাদের মাঝে কেউ হাই তুললে সে যেন মুখের উপর হাত রাখে। আর সে যখন আহ্ আহ্ বলে, তখন শয়তান তার ভিতর হতে হাসতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা হাচি পছন্দ করেন এবং হাই তোলা অপছন্দ করেন। কাজেই কেউ যখন আহ আহ শব্দে হাই তোলে, তখন শাইতান তার ভিতর হতে হাসতে থাকে।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।"

হাসান সহীহঃ তা'লীক আলা ইবনে খুযাইমাহ (৯২১, ৯২২), ইরওয়াহ (৭৭৯), বুখারী অনুরূপ।
সুনান আত তিরমিজী (তাহকীককৃত) ২৭৪৬

"আসিম ইবনু আলী (রহঃ) ... আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হাই তোলা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। সুতরাং তোমাদের কারো যখন হাই আসবে তখন যথাসম্ভব দমন করবে। কেননা তোমাদের কেউ হাই তোলার সময় যখন 'হা' বলে, তখন শয়তান হাসতে থাকে।"

ইসলামিক ফাউন্ডেশন নাম্বারঃ ৩০৫৯, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ৩২৮৯

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শয়তান থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখা হয়েছে। তিনি নিজেই বলেছেন, "প্রত্যেকের পেছনে একজন করে শয়তান/কারিন রয়েছে।" তখন সাহাবীরা বললো, আপনারও কি রয়েছে? তিনি বললেন, "হ্যাঁ আমার জন্যও আছে, কিন্তু সে ইসলাম গ্রহণ করেছে" কিংবা "তার থেকে আমাকে নিরাপদ রাখা হয়েছে।"

তাহলে বোঝা যায়, শয়তান থেকে যেহেতু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিরাপদ ছিলেন, তাই তিনি হাই তুলতেন না।

স্বপ্নদোষ না হওয়া

এ বিষয়ে উলামাগণ ইখতেলাফ করেছেন। এখানে তিনটি মতামত রয়েছে।
প্রথম মতামত হল:

কোন নবীর কখনো স্বপ্নদোষ হত না। ইবনুল মুলকিন বলেছেন, “সবচেয়ে স্পষ্ট কথা হল, নবীগণদের স্বপ্নদোষ হওয়া অসম্ভব।” *এটি غاية السول في خصائص الرسول ﷺ এর ২৯০ নং পৃষ্ঠায় বলেছেন।*
ইমাম সুয়ূতী রহিমাহুল্লাহও বিষয়টির দিকে জোর দিয়েছেন। তিনি প্রমাণ হিসেবে এনেছেন, তাবরানীর আনিত বর্ণনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে। রাস্তার মধ্যে বসে আলাপ আলোচনা করার যে হাদিস আছে, সেখানে তিনি এক পর্যায়ে এসে বর্ণনা করেছেন, “কোন নবীর কখনো স্বপ্নদোষ হয়নি। কারণ এটা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়।” *এটা “আল খসায়েসুল কুবরা” গ্রন্থে তিনি এনেছেন।*

এছাড়া ইমাম সুয়ূতী আরো বলেছেন, “রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যেমন স্বপ্নদোষ হয়না তেমনি তাদের স্ত্রীদেরও হতো না। কারন স্বপ্নদোষ হওয়াটাই হচ্ছে শয়তানের পক্ষ থেকে এবং শয়তান তাদের উপর কখনো প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে না।“ *এ বিষয়টি মুয়াত্তা মালেক এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ “তানভিরুল হাওয়ালেক”-এ তিনি উল্লেখ করেছেন।*

এক্ষেত্রে তাদের বর্ণনার দলিল গুলোর প্রথমটি হচ্ছে বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদিস। সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “সত্য স্বপ্নগুলো হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যে সকল স্বপ্নগুলো মানুষের ক্ষতি করে সেগুলো হচ্ছে শয়তানের পক্ষ থেকে।” যেহেতু খারাপ স্বপ্নগুলো শয়তানের পক্ষ থেকে, তাই স্বপ্নদোষও শয়তানের পক্ষ থেকে। এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম الحلم শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যা স্বপ্নদোষের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং খারাপ স্বপ্নের জন্যও ব্যবহৃত হয়।
দ্বিতীয় প্রমাণটি ইমাম মুসলিম এনেছেন, উম্মে সালমাহকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, কোন এক ব্যক্তি যদি সকালে ঘুম থেকে ফজরের সময় উঠতেই দেখে যে তার স্বপ্নদোষ হয়েছে, এমতাবস্থায় সে মানুষটি চাইলে কি রোজা রাখতে পারবে? তখন তিনি বললেন যে, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে গোসল ফরজ অবস্থায় সকাল করতেন, তার কোন ধরনের স্বপ্নদোষ হত না। এ অবস্থায় অনেক সময় তিনি তাঁর রোজা শুরু করতেন।”
এ থেকে বোঝা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কখনো স্বপ্নদোষ হতো না, যা উম্মে সালামাহ রা: এর সাক্ষ্য।

তৃতীয় যেই বর্ণনা, সেখানে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন, “নবীগণের কখনোই স্বপ্নদোষ হয় না, কারণ স্বপ্নদোষ শয়তানের পক্ষ থেকে আসে।” *এটি তাবরাণীতে বর্ণিত হয়েছে। তবে ইমাম আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।*

স্বপ্নদোষ বিষয়টি শয়তানের পক্ষ থেকে হয়, যেভাবে দেখা যায় হাই তোলার বিষয়টি শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। তাহলে, যে সমস্ত জিনিস শয়তানের পক্ষ থেকে হয় সে সকল জিনিস থেকে নবীগণ মুক্ত থাকতেন। এ হিসেবে বলা যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বপ্নদোষ হতো না।

দ্বিতীয় মতামত হল:
নবীদের স্বপ্নদোষ হওয়া সম্ভব। এই কথাটি যে ওলামাগণ বলেন তাদের দলিল হলো: উম্মে সালামাহ রা: কে যে প্রশ্ন করা হয়েছিল, স্বপ্নদোষ হওয়া ব্যক্তি গোসল না করে রোজা রাখতে পারবে কিনা, তখন যে তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নদোষ ছাড়াই গোসল ফরজ অবস্থায় রোজা রাখতে দেখেছি। এ থেকে এই কথাটি বোঝা যাচ্ছে যে, তার স্বপ্নদোষ হওয়ারও সম্ভাবনা ছিল। অর্থাৎ আমরা যখন দুটো বিষয়ের কোন একটিকে নির্ধারণ করি, তখন অন্যটিও হবার সম্ভাবনা রাখে। এখানে একটু ঘুরিয়ে পেচিয়ে এই দলিলটা দেয়া হয়েছে, তবে এটা সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে না।

তৃতীয় মতামত হলো:
যদি এই স্বপ্নদোষ অর্থ এমন হয়, যেটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় হয়ে থাকে, কোন ধরনের শয়তানের ওয়াসওয়াসা ছাড়া। তাহলে সে ধরনের স্বপ্নদোষ হওয়া নবীদের জন্য সম্ভব। আর যদি এটি শয়তানের ওয়াসওয়াসা সম্পর্কিত কোন স্বপ্নদোষ হয়ে থাকে, তাহলে সেই ধরণের স্বপ্নদোষ হওয়া সম্ভব না। *এটা ইবনে কাসির রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন।*

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ নবীদের স্বপ্নদোষ হওয়ার ব্যাপারটি সম্পূর্ণ নাজায়েজ মনে করেন। এবং আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার একটা হাদিস রয়েছে, যেখানে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেছেন যে, "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালবেলা স্ত্রী সহবাস ছাড়াই গোসল ফরজ অবস্থায় সকাল করতেন।" তাহলে দেখা যায়, স্ত্রী সহবাস ছাড়া গোসল ফরজ হয় তাহলে সেটি স্বপ্নদোষই হবে।

সাধারণত, স্বপ্নদোষ দুই ধরনের হয়। এক ধরনের হচ্ছে কোন কিছুই না হওয়া ছাড়া গোসল ফরজ হওয়া। আর দ্বিতীয় হচ্ছে, কোন কিছু দেখার ফলে গোসল ফরজ হয়। নবী-রাসুলদের ব্যাপারটা

হয়তো এই ধরনের, যা কোন কিছু দেখা ছাড়াই হত। যেটি মূলত শরীর বৃত্তীয় একটি প্রক্রিয়া। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরও এই ধরনের ঘটনা হয়ে থাকতে পারে।

খতনা

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মগতভাবে খতনা করা ছিলেন কিনা এই বিষয় সম্পর্কিত যে সমস্ত হাদিস পাওয়া যায়, সেগুলো প্রায় সব অগ্রহণযোগ্য।
আল মু'জামুল সগীরে এসেছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা আমাকে যে সম্মান দিয়েছেন, তার মধ্যে একটি হচ্ছে, আমি খতনা অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছি এবং আমার নামের সাথে নামকরণ করা মানুষ ইতিপূর্বে জন্মগ্রহণ করেনি।" *এই বর্ণনাটি দুর্বল।*

"মুসতাদরাকে হাকেম"-এ বর্ণিত হয়েছে, খুব বেশি প্রসিদ্ধ একটি কথা বলা হয় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খতনা অবস্থাতেই জন্মগ্রহণ করেছেন। ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ এই বিষয়টিকে অস্বীকার করেছেন। এই বিষয়ক হাদীসগুলো দুর্বল বলে তিনি প্রমাণ করেছেন এবং অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন যে, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খতনা অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছেন এই বিষয়ক অনেকগুলো বর্ণনা পাওয়া যায়।"

1. তার মধ্যে একটি হচ্ছে, তিনি খতনা অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছেন।
2. দ্বিতীয়টি হচ্ছে, জিবরাঈল আলাইহিস সালাম যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকে, হালিমাতুস সাদিয়ার এলাকায় লালন-পালন হওয়ার সময় বক্ষ বিদারণ করেন, তখন তাকে খৎনাও করেন।
3. তৃতীয়টি হচ্ছে, তার দাদা আবদুল মুত্তালিব তার জন্মের সপ্তম দিনে তাকে খতনা করান। এবং এটাই আরবদের প্রচলিত সংস্কৃতি ছিল।

এটা ইমাম ইবনুল কাইয়ুম রাহিমাহুল্লাহ তার "তোহফাতুল মাওদুদ বি আহকমিল মাওদুদ" গ্রন্থের ২০১ নং পৃষ্ঠাতে এনেছেন।
এছাড়া বিভিন্ন বর্ণনা থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, তার দাদা তার জন্মের সপ্তম দিনে তাকে খতনা করান। এবং এটাই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মতামত বলেই বিবেচ্য।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মগতভাবে খতনা করা ছিলেন, এগুলো প্রমাণিত সত্য হাদিস নয়। কারণ, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি এভাবে জন্মগ্রহণ করতেন, তাহলে সেটা তার মুজিযা হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতো না। কেননা পৃথিবীতে এখনো পর্যন্ত প্রচুর মানুষ রয়েছে, যারা জন্মগতভাবে খতনা অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন। এ কারণে ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "কেউ যদি জন্মগতভাবেই খতনা অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে, তাহলে তার খতনার উপর দিয়েই কোন কাটাকাটি ছাড়া ছুরি বা ব্লেড ঘোরানো সুন্নাহ। যাতে করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত তার আদায় হয়ে যায়।" তাহলে বোঝা যাচ্ছে, ইমাম শাফেয়ীও মনে করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মগতভাবে খতনা অবস্থায় ছিলেন না।

ছায়া

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছায়া ছিল কিনা? অনেক ধরনের বিদায়াতি, বেরেলবী কিংবা সুফিরা বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ছায়া ছিল না। এ বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয়। এতে তারা যেই দলিল-প্রমাণ গুলো পেশ করে, সেগুলো ধর্তব্য নয়। তারা "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নূরের তৈরী" এটা প্রমাণ করার জন্যই এগুলো বলে। তারা বলে যে, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নূরের তৈরী, আর নূরের কোন ছায়া হয় না।"

হাম্বলী একজন ইমাম ছিলেন, ইমাম বূতি। তিনি বলেছিলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ছায়া ছিল না। একথা থেকেই এই বিষয়টির উৎপত্তি। পরবর্তীতে অনেক ওলামায়ে কেরামগণ এ বিষয়টিকে খণ্ডন করে বিভিন্ন লেখা লিখেছেন। সুতরাং আমরা বলতে পারি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ছায়া ছিল।

আরেকটি কথা প্রমাণ দেয়া হয়, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামকে সার্বক্ষণিক একখণ্ড মেঘের ছায়া দিত। আমরা জেনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুবার সিরিয়ায় সফর করেছিলেন এবং দুবারই তাকে মেঘ সর্বদা ছায়া প্রদান করেছে। এছাড়া তায়েফের ঘটনায় জানা যায়, মেঘ তাকে ছায়া দিয়েছিল। কিন্তু, এর বাইরেও সর্বদাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মেঘমালা ছায়া দিত, এই দাবিটি ভুল। কেননা এ বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো প্রমাণ নেই, বরং এর বিপরীতে বর্ণনা রয়েছে। একটি হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

একজন স্বাভাবিক মানুষ ছিলেন। তার ছায়া ছিল, মানবিক সব ধরনের অনুভূতি ছিল। তার গরম লাগলে ছায়া গ্রহণ করতেন এবং কখনো ঠান্ডা লাগলে আবার গরমে যেতেন। সূরা হিজর এর ৯৭ নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা বলেছেনঃ

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ

"আমিতো জানি যে, তারা যা বলে তাতে তোমার অন্তর সংকুচিত হয়।"

এ থেকে বোঝা যায়, স্বাভাবিক মানবিক অনুভূতিগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মধ্যে ছিল।

যে সকল বর্ণনা দ্বারা তারা প্রমাণ করা হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সবসময় মেঘ ছায়া দিত, সেগুলো সবই দুর্বল বর্ণনা। বরং তার বিপরীতে প্রমাণ করা যায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো ছায়া গ্রহণ করেছেন। যেমন, ইমাম বুখারী তার ২৭৫৮ নং হাদিসে এনেছেন,

"ইসমাঈল (রহঃ) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যখন নাযিল হলঃ তোমরা যা ভালবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত কখনো পূণ্য লাভ করতে পারবে না। (৩: ৯২) তখন আবূ তালহা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ আল্লাহ তাঁর কিতাবে বলেছেন, (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) এবং আমার কাছে সব চাইতে প্রিয় সম্পদ হল বায়রুহা। আনাস (রাঃ) বলেন, এটি সে বাগান যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ নিয়ে ছায়ায় বসতেন এবং এর পানি পান করতেন।" (আংশিক)

তাহলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বদা যদি মেঘমালা ছায়া দিত, তাহলে বাগানের ছায়ায় বসা যথার্থ ছিল না।

খাব্বাব ইবনে আরাত থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট একটি অভিযোগ নিয়ে গেলাম। তখন আমরা দেখতে পেলাম, কাবার ছায়াতে চাদর দিয়ে আরেকটি ছায়া তৈরি করে, তার নিচে বালিশের মত একটা কিছুর উপর শুয়ে ছিলেন।" *এ হাদীসটি ইমাম বুখারী তাঁর কিতাবে এনেছেন।*

এই সকল হাদিস থেকে জানতে পারি, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরাসরি ছায়া গ্রহণ করতেন, কোন মেঘ এসে তাকে ছায়া দিত না।

হিজরতের ঘটনা সম্পর্কিত একটি হাদীসে পাওয়া যায়। ইমাম বুখারী,আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর পক্ষ হতে বর্ণনা করেছেন, “তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মানুষের সামনে দাঁড়ালেন এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসেছিলেন চুপ করে। তখন একজন আনসারী মানুষ, যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পায়নি। সে এসে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কে অভিবাদন জানাতে লাগলেন। অতপর দেখা গেল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারার উপর সূর্যের আলো এসে পড়েছে। তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তার চাদর নিয়ে সূর্যকে আড়াল করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেহারার উপর ছায়া হবার ব্যবস্থা করে দিলেন। এতে মানুষজন বুঝতে পারল, আবু বকর নন বরং মুহাম্মদই ﷺ নবী। তারা আবু বকরকে নবী মনে করে ভুল বুঝেছিল।”
এই হাদিসে দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারার উপর সূর্যের আলো এসে পড়েছে এবং আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাকে ছায়া দান করেছেন। তাহলে, “তাকে সর্বদা মেঘ ছায়া দেয়” বিষয়টি ভুল।

বর্জ্য

অনেকে বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বর্জ্য তথা প্রস্রাব, থুতু, কফ, ঘাম এসব মাটিতে পড়ার সাথে সাথে, মাটি তা খেয়ে ফেলত। এই ভুল কথাটি প্রচলিত আছে। এসম্পর্কিত তাদের প্রদান করা দলিলগুলো ভুল, মিথ্যা এবং জাল হাদিস। বরং এর বিপরীতে কিছু কিছু হাদীস রয়েছে যা প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ সমস্ত জিনিস গুলো মাটি খেয়ে ফেলত না। এটা মুজিযা নয়। তবে, এটা স্বাভাবিক, বালিতে কেউ প্রস্রাব করলে, বালি তা টেনে নেয়, এরকম ঘটতো।
আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “ইয়া রাসুলুল্লাহ, আপনিতো প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করতে যান, এরপরে আর কিছু দেখা যায় না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে, তুমি কি জানো না যে, আম্বিয়াদের থেকে যাহা কিছু বের হয় এগুলো মাটি গিলে ফেলে।” *এই হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা নেই।*

বরং এই ব্যাপার বর্ণনা আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘাম, ওযুর পানি, থুতু এসব সাহাবীরা সংগ্রহ করতেন। এগুলো যদি মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাটি গিলে ফেলতো, তাহলে সাহাবীরা এসব সংগ্রহ করতে পারতেন না।
ইমাম ক্বস্তলানি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "হাফিজ আব্দুল গণি আল মাকদিসীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্জ্য সমূহ মাটি গিলে ফেলে, এ ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য কোনো বর্ণনা রয়েছে? তখন তিনি বললেন, এ ধরনের যেসব বর্ণনা এসেছে সেগুলো সবই অস্বাভাবিক বর্ণনা। বরং স্পষ্ট কথা হচ্ছে, সাহাবীদের থেকে এমন কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না যে, তারা এমন কিছু দেখেছেন অথবা এমন কিছু উল্লেখ করেছেন। তবে তাদের থেকে এটুকু পাওয়া যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রস্রাব অনেকেই দেখেছেন মাটিতে হারিয়ে গেছে।"

তাহলে, এটি সুনির্দিষ্ট ভাবে বলা যায় না, আসলে কোনটা ঘটতো। স্বাভাবিক ভাবে এটা বলা যায় যে, হয়তো কখনো কখনো এমনটা ঘটতে পারে, তবে সব সময় ঘটতো না।

মাছি বসা

আরেকটি বিষয় শোনা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গায়ে কখনো মাছি বসতো না। এগুলো অতিরঞ্জন কথাবার্তা।
এ বিষয়ে ইবনে মুলকিন বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে একটি হলো, তার গায়ে কখনো মাছি বসতো না। তিনি "গয়াতুস সুল" গ্রন্থের মধ্যে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।
ইমাম সুয়ূতী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, কাজী আইয়াজ তার গ্রন্থে বিষয়টি সম্পর্কে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গায়ে কখনো মাছি বসতো না।
এ বিষয় প্রমাণে তারা এ ধরনের বেশ কিছু বর্ণনা করেন। যে হাদীসগুলো, সহিহ হাদিস না।
মাছি বসতো কিংবা বসতো না, এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই। তবে স্বাভাবিক ভাবে বোঝা যায়, একজন মানুষ হিসেবে তার গায়ে মাছি বসা অস্বাভাবিক কোন বিষয় না। কারণ, মাছি বসার মধ্যে কোন অসম্মান কিংবা ক্ষতি নেই। সুতরাং তার গায়ে মাছি বসলেও বসতে পারে, এ বিষয়টি সাব্যস্ত হয়।

দীর্ঘকায়

“রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অনেক মানুষের সাথে হাঁটতেন, তখন সেখানে তার থেকে লম্বা কেউ থাকলেও তাকেই বেশি লম্বা দেখাতো। তিনি কোথাও বসে থাকলেও, সেখানে তার থেকে লম্বা কেউ থাকলে, তবুও তাকেই বেশি লম্বা দেখাতো। অর্থাৎ তার মাথাটি সব সময় সবার থেকে উঁচু দেখাতো।” এরকম একটি কথা প্রচলিত আছে। এ বিষয়টি অনেকটা গ্রহণযোগ্য। কারণ বিভিন্ন হাদিসের বর্ণনা দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব বেশি দীর্ঘকায় ছিলেন না, আবার খুব বেশি ক্ষীণকায়ও ছিলেন না। তিনি মাঝারি গড়নের মানুষ ছিলেন। যখন কিছু মানুষের সাথে হাটতেন, তখন তাকে মাঝারি আকারেই দেখা যেত। সাধারণত, মাঝারি আকারের কোন মানুষ, লম্বা মানুষদের সাথে থাকলে তাকেও তখন দেখতে সেই লম্বা মানুষদের মতোই মনে হয়; এই অর্থেও হতে পারে অথবা এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুজিযা হতে পারে। যেহেতু দৈহিক সৌন্দর্যের বিষয়টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁকে মুজিযা হিসেবে দিয়েছেন, তাই এই ব্যাপারটিও তার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।